The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

দক্ষিণ চট্টগ্রামের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান - *হঁঅলা* (বিয়ের গীত): শিক্ষা ও গবেষণা রীতি বিশ্লেষণ

[Elements of the Social History of South Chittagong - Hanla (Wedding Songs): Analysis of Educational and Research Traditions]

Sultana Sukannya Bashar
Associate Professor, Department of Islamic History & Culture, Chittagong University, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 24 February 2025
Received in revised: 10 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Social historiography, Folk culture, Folk music, Wedding song, South Chittagong, Hanola Geet.

ABSTRACT

Wedding songs are a priceless addition to the folk culture of Bengal, yet they have become an increasingly rare component in the writing of social history. Folk music, in general, has long played a significant role in carrying and preserving collective thought in Bengali folk culture, and wedding songs, in particular, have earnd a distinctness due to their unique characteristics. These songs, created by women through their own efforts, encapsulate the emotions, love, affection, struggles, humiliation, and neglect experienced in married life. They serve as both a reflection of women's essential role in society and a testament to the injustices they endore. While wedding songs were once an inseparable part of traditional marriage ceremonies, modern influences have led to their gradual disappearance. However, they are still found in remote villages of Bangladesh. This research paper highlights the wedding songs of South Chittagong as akey conmponent of its folk culture, where they are locally known as `Hanla'. Hanla is one of the most emotionally resonating elements of the region's folk traditions. Analyzing its historical context it reveals that, its usage varies depending on the occasion. For example, in Cox's Bazar, Hanla is performed during ear-piercing ceremonies or circumcision rituals, whereas in other districts of Chittagong, it is exclusively performed at weddings. This research paper explores the themes, contextual variations, and diverse expressions of `Hanla` as an integral part of the folk culture of South Chittagong.

ভূমিকা

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদানে সমৃদ্ধ। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীতসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে লোকসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপকে বিভক্ত করা যেতে পারে বলে ধারণা করেন গবেষকগণ। এ সমস্ত ধারার ব্যাপ্তি ঘটে লোকমুখেই এবং লোক থেকে লোকান্তরে প্রবাহমান এ ধারা। লোকায়ত সমাজের নিরক্ষর কিংবা অর্ধ-শিক্ষিত লোকজন এমনকি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীও ঐতিহ্যগত ভাবে বংশ পরম্পরায় লোকসংস্কৃতির ধারাসমূহকে জিইয়ে রাখে। *বিয়ের গীত* তেমনি একটি ধারা যা বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান লোকসঙ্গীতের এক অনন্য অংশবিশেষ। এটি মূলত বিয়ের অনুষ্ঠানে গাওয়া হলেও পারিবারিক অনুষ্ঠানেও এ গীতের প্রচলন ছিল একটি সময়ে। নতুন প্রজন্মের ডিভাইস নির্ভর শৈশব কৈশোরের কাছে বাংলার লোকসংস্কৃতি এক লুপ্তপ্রায় উপাদানে পরিণত হয়েছে। জার্মান প্রবাদে বলা হয়েছে, যেকোন জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠে ঐ জাতির লোকসংস্কৃতিতে। সহজ ভাষায় লোকসংস্কৃতির উপাদান বলতে মূলত, রাজনৈতিক ইতিহাস বর্হিভূত সামাজিক উপাদানের চলমান ধারাসমূহকে বোঝায়। এক সময়ের জনপ্রিয় *বিয়ের গীত* লোকসংস্কৃতির এক অনন্য সংযোজন হলেও বর্তমান প্রজন্মের নিকট এটি অপরিচিত। পশ্চিমা সংস্কৃতি বিশেষ করে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলাদেশের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলিতে *বিয়ের গীতে*র প্রচলন আর নেই বলেই চলে। যদিও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বয়োজ্যেষ্ঠদের কণ্ঠে এখনো বিদ্যমান এ *বিয়ের গীত*, যাকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় *হঁঅলা* বলা হয়। চট্টগ্রামে লোকসঙ্গীতে *হঁঅলা* বেশ পুরোনো এবং সমৃদ্ধশালী একটি গীত হিসেবে প্রবন্ধের গবেষক এ গীত সর্ম্পকে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এ প্রবন্ধে *বিয়ের গীত* বা *হঁঅলা* উপস্থাপনের প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু, আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের ভিন্নতা, ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের বিবরণসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বাংলার আবহমান কালের বর্ণিল সামাজিক ইতিহাসকে চিত্রিত করেছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান সর্ম্পকে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে *হঁঅলা*। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন লোকগীতের মধ্যে হাইল্যা সাইর, পাইন্যা সাইর, *হঁঅলা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১] বর্তমানের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় মানুষ এতটাই কর্মব্যস্ত যে,

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে পশ্চিমা সংস্কৃতির সহজলভ্য বিনোদনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ, সামাজিক উপাদান নির্ভর সংস্কৃতির অংশ সমূহ একটি জাতির স্বকীয়তা বহন করে। এ স্বকীয়তার সাথে বর্তমান প্রজন্মকে নতুনভাবে পরিচিতি ঘটানোই এ গবেষণার উদ্দেশ্য যা বাস্তবায়নে লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়, *হঁঅলা* শিল্পীদের লিপিভূক্ত গীত এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের হঁওলার নিজস্ব বিশ্লেষণ ক্ষেত্র ব্যাপক এবং আগ্রহোদ্দীপক বিধায় একক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

লোক সংস্কৃতির অর্ন্তভুক্ত লোকজ সংগীতের অন্যতম উপাদান *হঁঅলা* বা বিয়ের গীত নিয়ে বেশকিছু গবেষণা হয়েছে যেখানে লোকসঙ্গীতের একটি শাখা হিসেবে *হঁঅলা* পরিচিতি পেয়েছে। শামসুজ্জামান খান (সম্পা.) *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- কক্সবাজার* (পৃ. ২৬৬) ওহীদুল আলম (সম্পা.) *চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য* (পৃ. ৪৬-৫২), ধনিরাম বড়ুয়ার *রামুর লোক সাহিত্য* (পৃ. ১২৫), মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী (সম্পা.) *বাংলাদেশের লোক-সংগীত পরিচিতি*, (পৃ. ২৮৭), মনোয়ারা বেগমের *মুসলিম বিয়ের গানে বাঙালি মুসলিম সমাজ* (পৃ. ১১৩) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে *হঁঅলার* উৎপত্তি ও লোকসঙ্গীতের সাথে সম্পৃক্ততা দেখানো হলেও তার বিশদ ব্যাখ্যা দেখা যায় না। উত্তরাঞ্চলের *বিয়ের গীত* নিয়ে একক গবেষণাকর্ম দেখা গেলেও চট্টগ্রামের *বিয়ের গীত* সম্পর্কিত একক গবেষণা দেখা যায় না। এ প্রবন্ধে বিয়ের অনুষ্ঠান ভেদে *হঁঅলার* প্রয়োগ, প্রেক্ষাপট, বর্ণিত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশের মাধ্যমে নারী জীবনের পর্যায়সমূহে সমাজের বৈচিত্র্যময় প্রভাব তুলে আনা হয়েছে বিধায় এ প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা রয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি একটি গুনগত গবেষণা এবং এটি Grounded theory (GT) ও Historical Research Technique (HRT) তত্ত্বের সমন্বয়ে সম্পন্ন হবে। (GT)-এর আলোকে স্থানীয়দের হঁঅলা শিল্পীদের সাক্ষাৎকার হতে এ গীতের ইতিহাস ও ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করা হবে। গবেষণাটিতে (HRT)-এর মাধ্যমে ইতিহাসের গ্রন্থ ব্যাখ্যা করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে নির্দেশ করবে। এ গবেষণা পদ্ধতি ইতিহাসসমৃদ্ধ পুরাতন গ্রন্থাদির সনাক্তকরণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসভিত্তিক গবেষণায় মূলত অতীতের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে বর্তমান সময়ে তার কিরূপ প্রভাব পড়ে তা বিশ্লেষণ করে একটি সমালোচনামূলক অনুসন্ধান সম্পৃক্ত থাকবে। তাই এতে Historical Study এর পাশাপাশি GT approch টিও ব্যবহার করা হবে।

হঁঅলা গীতের উদ্ভব ও লোকসংস্কৃতিতে তার অবস্থান

বাংলার লোকসংসংস্কৃতির উৎপত্তি ঘটেছে সর্বপ্রাণবাদ থেকে।[২] ফলে বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থানে আঞ্চলিক সংস্কৃতির উদ্ভাবিত বহু বিষয় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যকে ছাপিয়ে সকলের নিকট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ যেকোন উদ্ভাবন-আবিষ্কার ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও প্রয়াসের ফল যার সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক আছে।[৩] যদিও সকল মানুষই সৃষ্টিশীল নয়, তবে তারা সৃজনশীল মানুষের সাথে থেকে গ্রহণশীল হয়ে সংস্কৃতিবান হয়ে উঠেন। আর এভাবেই সংস্কৃতির ধারা সচল থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে। অর্থাৎ, সর্বসাধারণের কাছে যে সমস্ত বিষয় সমূহ নির্বিবাদে গ্রহণযোগ্য তাই লোকসংস্কৃতির অংশ, যা সামাজিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর পরিধিও বেশ বিস্তৃত। আমাদের মনে রাখতে হবে- গ্রামের সাধারণ মানুষ লোক-পরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে শত শত বছরের প্রাচীন যেসব গল্প-কাহিনী, সংগীত-গাঁথা, ধাঁধা-প্রবাদ, হাসি-ঠাট্টার কথা এখনো ধরে রেখেছে তাকেই লোকসাহিত্য বলে।[৪] কেননা, আদিম সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে লোকসাহিত্যের উৎপত্তি।[৫] বলা হয়- Folklore perpetuates the pattern of culture and through its study we can often explain the motifs and the meaning of culture. The science of folklore, therefore, contributes in a great measure to the history and interpretion of human life.[৬] অর্থাৎ, প্রাচীন যুগ এবং সমাজ সভ্যতার বহু বিষয় নিহিত রয়েছে লোকসংস্কৃতির মধ্যে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, লোকসাহিত্য বলতে লোক-মুখে প্রচলিত গাঁথা, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদিকেই বোঝানো হয়, যা লোকসংস্কৃতির অংশ।[৭] সমাজের সাধারণ ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ, জাত-শ্রেণী, আচার-প্রথা, সাহিত্য, সঙ্গীত, উৎসব, স্থাপত্য, শিক্ষা, শিল্পকলার সকল শাখা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল কিছুই সামাজিক ইতিহাসের আওতাভুক্ত।[৮] সামাজিক ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে বিখ্যাত ব্রিটিশ গবেষক ও ইতিহাসবিদ জর্জ ট্রেভেলিয়ন (১৮৭৬-১৯৬২) বলেন- সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে রাজনীতি ব্যতিরেকে একটি জাতির ইতিবৃত্ত।[৯] সুতরাং, একটি জাতির ইতিবৃত্তের ইতিহাসে উক্ত জাতিভুক্ত সকল ধর্মের মানুষের মিশ্রণ ঘটলেও স্থানীয় জীবনযাপন প্রক্রিয়া এ ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে বিশেষভাবে। কেননা মানবমনের অন্তর্নিহিত শক্তি, কৌতুহল ও প্রতিভার অর্থাৎ জীবনযাপনের বিকাশ ঘটে সংস্কৃতির মাধ্যমে।[১০] জারি-সারি, মারফতি, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া, বাউল, গম্ভীরার সুরের লহরীতে সমৃদ্ধি বাঙালির হৃদয়তন্ত্রী। এসবের মাঝে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রায় সম্পৃক্ত হয়েছিল *বিয়ের গীত* যার স্বকীয়তায় এটি পরিণত হয়েছে এক জীবনভিত্তিক অনবদ্য শিল্পমাধ্যমে।[১১] দক্ষিণ চট্টগ্রামের

আঞ্চলিক ভাষায় বিয়ের গীতকে বলা হয় *হঁঅলা*। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রেক্ষিতে গীতের ভাষাগত পরিবর্তন ব্যতীত এর বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ একই বলেই লোকসংস্কৃতির ব্যাপকতায় বিশেষ স্থান দখল করেছে এ গীত। এর বিষয়বস্তু তৈরি হয়েছিল সমাজের নানা সূত্র থেকে এবং বহুলাংশে নারীর জীবনকেন্দ্রিক। উপলক্ষ ও উৎসবভেদে, বিষয় ও অঞ্চলভেদে লোকসঙ্গীতকে বহুভাগে বিন্যাসিত করা হয়েছে, যার একটি ভাগ হলো মিশ্র ভাববিষয়ক গান এবং বিয়ের গীত বা *হঁঅলা* এরই অর্ন্তগত। বিয়ের আয়োজন যেহেতু মেয়েলি আচারবেষ্টিত তাই দেখা যায় ঢেঁকি, যাঁতা,পাটাতে কাজ করতে করতে *বিয়ের গীত* গেয়ে পল্লীরমণীরা কাটিয়ে দেয় সারারাত। তাদের কাছে বিনোদনের সবচেয়ে মনোহরী উপাদান হল *হঁঅলা*।[১২] গর্ভাধারণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, খৎনা, কান ফোটানো, সখি পাতানো ইত্যাদি উপলক্ষে গীত রয়েছে। প্রেম-বিরহ ও নাইয়রকেন্দ্রিক গীতও আছে। এসব গীতে বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়ার, আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র ফুটে উঠে; এগুলিতে আধ্যাত্মিকতার বা তত্ত্বের লেশমাত্র নেই। এ কারনে তাদের আচার ও গীতে বস্তুমুখী ও ইহমুখী চিন্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে।[১৩] গবেষক আবদুল হাফিজের মতে, লোকসঙ্গীতের প্রায় শতাধিক শ্রেণি বিভাগের মধ্যে এ গীতের উৎপত্তি বাংলায় এবং এর শিল্পীরা বেশিরভাগই নারী।[১৪] *হঁঅলা*র ভাষা, শব্দসম্পদ, বাক-ধারা ও পারিপার্শ্বিক উপজীব্য বিষয়গুলির বিচার বিশ্লেষণে ধারণা করা হয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে এ গীতের উদ্ভব এবং সাধারণের মুখে মুখে চলে আসছে।[১৫] এ গীত ধর্মনিরপেক্ষ এবং অঞ্চলভেদে উৎসব আয়োজনে যৎসামান্য পরিবর্তন দেখা গেলেও মূলত নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাসই এ গীতের উপজীব্য বিষয়।

হঁঅলা গীতের স্রষ্টা

দক্ষিণ চট্টগ্রামের *হঁওলা*র সৃষ্টি হয়েছে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের একই ঘরনার গানের স্রষ্টাদের মাধ্যমে অর্থাৎ নারী কণ্ঠেই। গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ নারীই এ গানের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যই *হঁওলা*কে মেয়েলি গীতের একটি শাখা বলা হয়।[১৬] এ গানগুলি অত্যন্ত সাদামাটা শব্দের গাঁথুনিতে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় রচিত।[১৭] একক বা দলীয়ভাবে এ গীত গাওয়ার রেওয়াজ আমরা দেখতে পাই দক্ষিণ চট্টগ্রামের জেলাগুলিতে।[১৮] বিশেষ করে গৃহস্থ পরিবারের কন্যাসন্তানের কান ফোড়ানো কিংবা সুন্নতে খৎনার অনুষ্ঠানে *হঁঅলা*র আয়োজন করা হলেও বিয়ের অনুষ্ঠানে *হঁঅলা*র প্রচলন বেশি কারণ পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে এ গীত রচিত। মিশ্র ভাববিষয়ক গানগুলিতে আর্থ-সামাজিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা বিষয়ক বিষয়গুলি স্থান পায়। সে হিসেবে *বিয়ের গীত* বা *হঁঅলাতে*ও আমরা নারী সমাজের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বিচিত্র ভাব-আলেখ্য দেখতে পাই। মেয়েলি কণ্ঠে বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে এ গীতে।[১৯] বিয়েবাড়ীর রীতিনীতিগুলি মূলত নারী পরিচালিত হওয়ায় দেখা যায় প্রথম থেকেই এর আয়োজন শুরু হয়ে যেত। পানসল্লা থেকে কনে দেখা, ছেলে দেখা, পাকা কথা, গায়ে হলুদের সময় পানচিনি, পানখিলি, হলুদ বাটা, গায়ে হলুদ দেয়া, মেহেদি পরা সহ বহু লৌকিক আচারে *হঁঅলা*র প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ করে গায়ে হলুদে বাদ্য বাজিয়ে নাচ গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে উৎসবমুখর করে রাখা হত।[২০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাঙালি জীবনের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের গীত হত যা লিখিত ছিল না। লিখিত হয়নি। কক্সবাজারের গ্রামাঞ্চলে *হঁঅলা* গায়কেরা অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবেই *হঁঅলা* তৈরি করে পরিবেশন করে থাকেন।[২১] এসব গীত একেকটি অঞ্চলের মৌলিক বস্তু কেননা এটি শুধু মফঃস্বল নয় একেবারে মেয়েমহলের সৃষ্টি, তাই *হঁঅলা*র মধ্য দিয়ে সমাজের নিখুঁত চেহারা ফুটে উঠে। এর বৈশিষ্ট্য হল সুরের মৌলিকত এবং এটি সম্পূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি।[২২] বাংলার ছড়া, শ্লোক, গীত, কল্পকাহিনির ধারক ও সংরক্ষক যেহেতু মেয়েরা, তাদের মাধ্যমে এসব প্রচারিত হতে থাকে দূর দূরান্তে।[২৩] একান্ত মর্মস্পর্শী ও অলিখিত এ গীত বর্হিজগতের প্রভাবশূন্য এবং অন্তঃপুর-চারী নারী সমাজেই সীমাবদ্ধ।[২৪] অর্থাৎ, নারীরাই এ গীতের স্রষ্টা।

হঁঅলায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র: *হঁঅলা*র ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না কারণ এতে সুরের তাল-লয় রক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। যদিও মিশ্র ভাববিষয়ক যেকোন গীতে খুব সাধারণ কিন্তু বহুল প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকেই। দেশের যেসমস্ত অঞ্চলে এ গীতের প্রচলন রয়েছে, সরেজমিনে দেখা যায় প্রায় সকল অঞ্চলেই হারমোনিয়াম, ঢোলক বা ঢোল, করতাল, মন্দিরা, কাঁশী, ডমরু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।[২৫]

ছবি: হারমোনিয়াম, ঢোলক বা ঢোল, মন্দিরা, ডমরু, করতাল, কাঁশী।

*হঁঅলা*র ক্ষেত্রবিশেষ

*হঁঅলা*র প্রথম ও মূল ক্ষেত্র হল বিবাহ; যা বাঙালি জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় একটি সামাজিক উৎসব। এ উৎসব অতি অবশ্যই ধর্মীয় শাস্ত্রের নানারকম বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। গৌড়ীয় মুসলমানদের প্রভাবে আরাকানের

বিবাহানুষ্ঠানে কিছু আনুষ্ঠানিকতার প্রচলন ঘটে।[২৬] তবে ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই বেশ সংক্ষিপ্ত এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় বিধিসমূহ ব্যতীত অন্যান্য আচারগুলি মূলত দেশাচার ও লোকাচার ভিত্তিক বলে সকল ধর্মের বিবাহাচারগুলিও প্রায় অভিন্ন।[২৭] ফলে মূল বিবাহের আগে ও পরে বিবাহাচারগুলির আয়োজন বেশ কয়েকদিন ধরে চলমান। এ সমস্ত আচারগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে- পানচিনি, গায়ে হলুদ, মেহেদি লাগানো, থুবড়া ফোটা, ক্ষীর খাওয়া, জলভরণ, সোহাগমাখা, খাততা ভাঙ্গণ, বরস্নান, ফোড়ল ডুবা, দুধের ধার শোধন, সরিষা উদরানো, বরণডালা, বর বিদায়, মাড়োয়া সাজান; দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়- বরবরণ, কনে সিংরানো, হাংগড় ধরা, শা'নজর এবং শেষ পর্যায়ে উপস্থাপিত হয় বধুবরণ, পাশা খেলা, বাসর জাগা, বাসি স্নান, নাইয়র সহ অন্যান্য আচারাদি।[২৮] এসমস্ত আয়োজনগুলি অতীতে নারীসমাজের দ্বারাই পালিত হত নবদম্পতির কল্যাণার্থে। বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে এত আচার পালন করা না হলেও যে কয়েকটি এখনো স্বমহিমায় টিকে আছে সেগুলির আয়োজনে *হঁঅলা গীত* বিরাজমান। বিয়ের আনুষ্ঠানিক গীতি পর্যায়ের গান এটি।[২৯] সাধারণত বিয়ের আগেই নানা স্থান থেকে স্বজনদের আগমনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে বিয়েবাড়ী। সকলের সহযোগিতায় চলে পিঠা, মুড়ি-মুড়কীসহ নানান খাবার তৈরির আয়োজন। এগুলি তৈরির সময় *বিয়ের গীতে*র মাধ্যমে পরিবেশটি আরো আনন্দঘন ও উৎসবমুখর হয়ে উঠে।[৩০] বিশেষ করে চট্টগ্রামে বিবাহ উপলক্ষে বর-কনে উভয়ের বাড়ীতেই বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। বাড়ির অন্দরমহলে মেয়েরা মিষ্টি সুরে গান পরিবেশন করে যার মূল বিষয়বস্তুতে থাকে বর-কনে বিশেষত কনের বৈবাহিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা।[৩১] প্রবন্ধে উল্লেখিত বিয়ের আচার ভেদে যে সকল গানের প্রচলন দেখা যায় তার কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো:

ক. বর-কনের ভাব বিনিময়-

ফুল টঙ্গিতে বসিয়া রে ও শের (২)
রাইহান দুলারে মোর বাজাইবু মুরালি রে (মোর হায় হায়)
মুরালি রো সুরে সুরে ও শের (২)
রুবি হইন্যারে মোর গরে থাকি নারী রে (ঐ)
তোঁয়ার ফোঁয়ারে গেলে এ রে ও শের (২)
রাইহান দুলারে মোর হারে ডাইক্কুম মা-বাফরে (ঐ)
আঁর ফোঁয়ারে গেলে এ রে ও শের (২)

রুবি হইন্যারে মোর[৩২]... আঁর গরত আছে বুরা মা-বাফরে (ঐ) - বিয়ের পাকা কথা হওয়ার পর বরের মনে তার হবু স্ত্রীকে নিয়ে সংসার গুছানোর পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে হবু স্ত্রী তার বাবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কাদের 'মা-বাবা' ডাকবে সে কাতরতার বিকল্পে হবু স্বামীর মা-বাবাকে 'মা-বাবা' বলে সম্বোধন করার আশ্বাস দিতে দেখা যাচ্ছে।

খ. বর সাজানো-

সোনার নাপিতা রে
আঁয়ার বাড়ী যাইও
সোনার নরইং রূপার বাটী সঙ্গি গরি নিও
ও সোনার নাপিতা রে[৩৩]- স্বর্ণের ক্ষুর,নরুন কিংবা রূপার বাটি নিয়ে গোঁফদাড়ি কামানোর জন্য নাপিতকে

আদেশ দেয়ার মাধ্যমে মূলত ছেলের প্রতি মা-বাবার অপত্য স্নেহের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ গানে। একই সাথে বিয়ের আমেজে উৎসবমুখরতাও যেন স্থান পেয়েছে এতে।

গ. বরের পিতা-মাতার আশঙ্কা

নীচমে তে বসুমতী
উপরে আসমান
তখতের দুলা তখতে বসি
লইল আল্লার নাম
নামিল নামিল সোহাগ আঁর সোহাগ নামিল রে।
মা'অর হাতর আমসরতী
বইনর হাতে ধুপ
আচ্ছা গরি আঁকি লইও
ভালা গরি আঁকি লইও
মার দুর্লভ পুত।

নামিল নামিল সোহাগ আঁর..[৩৪]- বরের বাড়িতে এ গানটি গাওয়া হয়। মায়ের আদরের ছেলেটি সংসার জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সংসারের নানা রকমের আপদ বালাই থেকে দূরে রাখতে বরের মা কুলোতে আম পাতা ও ধুপকাঠি সাজিয়ে বরের মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করতে বলা হয়।

মা-বাফর আদইজ্জা ফোয়া সাইফুল দুলা ভাইরে
আজ্জু গরি গরার বিয়া তারে রে রে (মোর হায় হায়)....
আদর গরি যত্তন গরি তোয়ারে গইজ্জে এত বড়

আজিয়াত্তুন মা-বাফরে গরি দিলা ফর রে (ঐ)[৩৫]- বিয়ের পর ছেলে নিজের মা বাবার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়বে এমন আশঙ্কায় মা বাবার অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে।

ঘ. বরযাত্রী বরণ

রাস্তা যেদ্দুর বৈরাতী এদ্দুর (২)
আল্লাহ রে মোর হন সিকদারর বৈরাত রে (মোর হায় হায়)
হালত আইস্যে ফুর্ণিমা জোয়ার (২)
এ বৈরাতত কুর হাইয়া রইয়ে রে (ঐ)
হড়ে গেল গই নোয়া হইন্যার বোনাই (২)

এ বৈরাতত পার গরাই লইত্যে রে (ঐ)[৩৬]- পূর্ণিমার প্রভাবে খালে জোয়ারের পানি পেরিয়ে বিশাল বরযাত্রীকে বরণ করতে নববধূর দুলাভাইকে আহবান করা হচ্ছে এ গানে। এতে মূলত নববধূর হবু বরযাত্রী ও দুলাভাইকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ঘ. বিয়ের অনুষ্ঠানে বেয়াইনদের হাস্যরসাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশ

বাছি বাছি তুলেরলে ফুলরে (২)
ওরে ফুলের নসা ফুলের হলি (মোর হায় হায়)
সরু জাইল্যা জাল ভাসাই আইতে (২)
দেইক্কে রে সুন্দর সুনাই
ওগ্গা ফুল দনারে বইনরে
হানে তুইল্যা দিতাম (ঐ)
তুই হড়িয়ার সরু জাইল্যা
ওগ্গা ফুলঅর খোজর
এক লাথি মারিরে জাইল্যা

দইজ্জাত দিয়ুম ভাসাই (ঐ)[৩৭]- এ গানে ফুলের বাগান থেকে সবচেয়ে সুন্দর ফুলটিকে কানে গুঁজে (অর্থাৎ পাত্রী হিসেবে বেছে নেয়া বোঝানো হয়েছে) নেয়ার আগ্রহ দেখে নববধূর ভাবীদের কণ্ঠে হাস্যরসাত্মাক অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। শেষ লাইনে নিতান্তই মজার ছলে নতুন বরকে (সরু জাইল্যা) সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। মূলত, বিয়েবাড়িতে গানের মাধ্যমে এমন ঠাট্টা চলতে থাকে উভয়পক্ষের বেয়াইনদের মধ্যে।

আইলর কোণত বাসা বাঁধি চাইরো বইনে নাচে
ঘন বইনর নাচা বেশি সুন্দর রে
যে বইন নাচিত ফারে ঢোলর তালে তালে

সে বইন ফাইবু বখশিশ রে[৩৮]-অনুষ্ঠানে বউয়ের বোনদের মধ্যে যার নাচ সুন্দর হবে তাকে বর বখশিশ দিবে।

ঙ. বধূ বিদায়

স্বামী- বিবি ন হাঁদিও এন গরি
বিদেশ গেলে সোনার আঙটি দিয়ুম ফাডাই
বিবি- ন হাঁদির আঙটির লাই
ফরান জ্বলি ফুরি যারগৈ মা বইনর লাই।
স্বামী- তোর বাফে গইজ্জেল বড়াই তোরে ন দিব বিয়া

দুর্লভ জামাই ফাই আজিয়া কেনে দিল বিয়া।[৩৯]- প্রথমত এতে মা বাবা আত্মীয়দের ছেড়ে যাওয়ার কষ্টে ক্রন্দনরত স্ত্রীর মন ভোলাতে স্বামী বিদেশ থেকে আংটি পাঠানোর কথা বলেছে আর দ্বিতীয়ত মেয়েকে বিয়ে দিবে না বলে পাত্রপক্ষের নিকট কন্যার বাবা বড়াই করলেও শেষপর্যন্ত বিয়ে দিয়েছেন- এসব বলে নববধূকে ব্যস্ত রাখার প্রচেষ্টায় ছিলেন স্বামী।

সাম্মান যত চলে নুরু তত হাঁদে (২)
ন দেহের মা-বাফর মুখ খান রে (মোর হায় হায়)
আস্তে ধীরে বাইয়ো রে সাম্মান মাঝি ভাইরে (২)
হুইন্তাম রে বাফ মায়ের হান্দন রে (ঐ)
তিন ভরি সোনার লালসে বাফ মা (২)

এফার কুইল্লা বানাইয়ে মোরে রে (ঐ)[৪০]- নদীর অপরপ্রান্তে বিয়ে দেয়ায় সাম্পানে বসে নুরু নামের মেয়েটি কান্নাজড়িত কণ্ঠে মাঝিকে ধীরে বাইতে অনুরোধ করছিল যেন মা বাবাকে সে আরো কিছুক্ষণ দেখতে পায়।

চ. বধূ বরণ

গুরা দুলা বাইন্দে নবীন কোটা রে (মোর হায় হায়)
নবীন কোটায় টুলকী মাইলে ঝুন্নুর ঝুন্নুর লরে (২)
গুরা কইন্যা চমকি চমকি উড়ের লে (ঐ)
ন ডরাইয় ন ডরাইয় অ-গুরা কইন্যা
প্রেম রশিদি বাঁধি রাইখম অ-গুরা কইন্যা

ছারি নদ্যুম তোরে-[৪১] জীবনের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশে নববধূর মানসিক অবস্থা বিবেচনায় তাকে আজীবন যত্নে রাখার আশ্বাস দেয়া হয়েছে এ গানে।

ছ. বউ-শাশুড়ির টানাপোড়নের সম্পর্ক

মুরার উঅরে রেঙ্গুনি তোতা (২)
মাইল্লর তোতা মর হাডিলো ফুলর হরা (মোর হায় হায়)
গরত আ-আছে চঞ্চইন্যা ওরি (২)

মাইল্লর তোতা আঁই কি বলি দিয়ুম জওয়াব (ঐ) [৪২]- যেকোনো কাজে ভুল ধরে উচ্চবাচ্য করা শাশুড়ির ভয়ে তটস্থ থাকা বউয়ের করুণ বিলাপের নমুনা রয়েছে এ গানে।

ঞ. নাইয়র গমন

মর ফরাণে সইতকা গরের
ঐ মাইজ্জা বু বইন রে (২)
মুই এক্কানা বারি ফাইক্কায় আইয়ুম রে (মোর হায় হায়)
বারি ফাইক্কায় আইবার সময়
নাজিম দুলা দেইক্কে (২)
নাজিম দুলা জাটকা মারি দইজ্জে রে (ঐ)
জাটকা মারি ন দইজ্জ রে নাজিম দুলাভাই রে (২)

মোর গায়ে আছে আষ্টোমাইস্যা জাদু রে (ঐ)[৪৩]- আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা মায়ের শারীরিক অবস্থায় মায়ের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা এবং সেখানে তার দুলাভাইকে খুনসুটি না করতে অনুরোধ করে তার গর্ভধারণের আভাস দেয়া হয়েছে।

চ. সৎ মায়ের সংসারে অবহেলিত সন্তান

আষ্টো মাইস্যা গুরা লালু
গুরা লালুর মা অরে মারা গিয়ে রে (মোর হায় হায়)
লালুর মা তো মরণোর ফরে (২)
আউন্যেরে লালুরতন আতাই রে (ঐ)
আতাই মা রো জ্বালানি লালু (২)
গুরা লালু হাদেল্লে ধুইলে গইজ্জার রে(ঐ)
হরজ জ্বালা ন মরম মুই রে
ভাতর জ্বালা ন মরম মুই রে

লালুর বাফরে মরম রে.. লালুর জ্বালায় রে (ঐ)[৪৪]- সৎ মায়ের সংসারে ছোট বাচ্চা মানসিক যন্ত্রণায় মাটিতে শুয়ে কান্নাকাটি করছে একইসাথে বাচ্চাটির জন্য যে খরচ হচ্ছে তা সহ্য করতে না পেরে সৎ মা তার স্বামীকে ক্রমাগত বাচ্চার বিরূদ্ধে বুঝিয়ে যাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।

সাধারণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিবাহ সংক্রান্ত উৎসবের একটি স্ট্রাকচার লক্ষ্য করা যায়, যাতে সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও অভীপ্সা প্রকাশিত হয় যার পুনরাবৃত্ত হয় না।[৪৫] আর এ উৎসবের অন্যতম অংশ হিসেবে *হঁঅলা*র প্রসারে প্রচারমাধ্যমগুলির এগিয়ে আসা জরুরি। আঞ্চলিক গানগুলি লোকমুখে চর্চিত হলেও বর্তমানে সেগুলিকে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে পরিচিত করতে যন্ত্রমাধ্যমে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।[৪৬] মানব জীবনের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের একটি নিবিড় সর্ম্পক রয়েছে বলেই লোকায়ত সমাজের আপামর জনগোষ্ঠীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত সাংস্কৃতিক পর্যায়টিকে জিইয়ে রাখে।[৪৭] আকাশ সংস্কৃতির দাপটে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যে বিকৃতির সূত্রপাত ঘটেছে তাতে দেশিয় তথা আঞ্চলিক সংস্কৃতির বহুল চর্চা আবশ্যিক। স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া সংগীত ও লোকাচারবিদ্যা বিভাগের অধীনে *হঁঅলা*র সংযুক্তি বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে আরো ঋদ্ধ করবে।

উপসংহার

একটি জাতির পরিশীলিত জীবনবোধের পরিচয় ফুটে উঠে তার আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাবে। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টি দক্ষিণ চট্টগ্রামের সামাজিক ইতিহাসের প্রত্ন উপাদানের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যা আজো প্রবাহমান। স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত এ উপাদান অত্র অঞ্চলের সাংস্কৃতিক আবেদনকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। *হঁঅলা*র শব্দগঠনে আধুনিকায়ন দেখা গেলেও সুর ও ছন্দে স্বীয় আভিজাত্য লক্ষণীয়। স্থানীয়দের মাঝে এ গীতের আবেদন এখনো অপরিসীম। নতুন প্রজন্মের শিল্পসত্তা এ গীতের প্রতি বিশেষ আর্কষণবোধ করে বিধায় তাদের কন্ঠে শোনা যায় আধুনিক *হঁঅলা*, শব্দের আধুনিকায়ন ঘটলেও সুরের ভিন্নতা দেখা যায় না। স্থানীয় সংস্কৃতি বিকাশে *হঁঅলা*র চর্চা ও প্রচার অত্যাবশকীয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পীদের যথার্থ মূল্যায়ন ও *হঁঅলা* লিপিবদ্ধ করা খুবই জরুরি। লোকসঙ্গীতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে *হঁঅলা* সংরক্ষণ ও তার প্রসারে সরকারি উদ্যোগ ও অনুদানের প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতি মূলত চর্চার মাধ্যমেই সমৃদ্ধ হয় এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে পরিচিতি লাভ করে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের *হঁঅলা*র প্রাচীনত্ব শুধু সঙ্গীতপ্রেমীদেরই নয় বরং ইতিহাসপ্রেমীদের নিকটও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করবে বলে আশা করা যায়। এর বিশেষত্ব যে আবেদন পিরিলক্ষিত হয় তা আঞ্চলিক পর্যায় ছাড়িয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রসার লাভ করবে সঠিক চর্চা ও সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের আগ্রহের ভিত্তিতে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ মুহাম্মদ নুরুল হুদা (সম্পা.), *লোকসঙ্গীত*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,২০০৭), পৃ. ১০৪-১০৬।
২ আবদুল হাফিজ, *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃ. ১৮।
৩ সুকান্ত একাডেমী (সম্পা.), *ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি*, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৮),পৃ. ২৭।
৪ আশরাফ সিদ্দিকী, *লোক সাহিত্য*, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৬৩), পৃ. ৭০।
৫ A.M. Espinosa, *Standard Dictionary of folklore, Mythology and Legend*, (SDFML, New York, 1949), p. 399.
৬ পূর্বোক্ত।
৭ আশরাফ সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।
৮ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ৩য় খন্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ০২।
৯ G.M. Trevelyan, *English Social History*, (London: Longmans, Green and Co, 1962 ed), p. vii.

[১০] হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭), পৃ. ১৮৩।
[১১] মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *লোকসাহিত্যের নানা দিক*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৮১।
[১২] ধনিরাম বড়ুয়া, *রামুর লোক সাহিত্য*, (কক্সবাজার: কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী, ২০১৭), পৃ. ১২৫।
[১৩] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪।
[১৪] আবদুল হাফিজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩৮।
[১৫] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোক-সংগীত পরিচিতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ২৮৭।
[১৬] মুহাম্মদ নুরুল হুদা (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
[১৭] মনোয়ারা বেগম, *মুসলিম বিয়ের গানে বাঙালি মুসলিম সমাজ*, (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১১৩।
[১৮] শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- কক্সবাজার*, ঢাকা, বাংলাএকাডেমি, ২০১৪, পৃ. ২৬৬।
[১৯] নুরুল ইসলাম চৌধুরী, *চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি*, (চট্টগ্রাম: অনুপম মুদ্রণ, ১৯৬৫), পৃ. ৮০।
[২০] নসরুল্লাহ খোন্দকার, শরীয়তনামা, (আবদুল করিম সম্পাদিত), (চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫), পৃ. ১২৫।
[২১] সাক্ষাৎকার: আবুল কাশেম, পিতা: প্রয়াত মোক্তার আহমেদ, মাতা: জরিনা খাতুন, বয়স: ৬৬বছর, গ্রাম: মধ্যম মেরংলোয়া, কক্সবাজার। তারিখ: ২০-০৫-২০২৩, সময়: সকাল ১০:৪০।
[২২] ওহীদুল আলম (সম্পা.), *চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য*, (চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম জিলা কাউন্সিল, ১৯৬৩), পৃ, ৪৯।
[২৩] নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, *বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি কথকতা*, (ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ০৭, ১৮।
[২৪] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।
[২৫] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩।
[২৬] মাহফুজুর রহমান আখন্দ, *আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১৩), পৃ. ১৬৮-১৬৯।
[২৭] মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।
[২৮] ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলার সংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ১৭৩।
[২৯] মুহাম্মদ নুরুল হুদা (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
[৩০] শঙ্কর সেনগুপ্ত, *বাঙালী জীবনে বিবাহ*, (কলিকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন, ১৯৭৪), পৃ. ৩৯৮।
[৩১] ওহীদুল আলম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৪৫।
[৩২] সাক্ষাৎকার: শাহাব উদ্দিন খোকা, পিতা- প্রয়াত বদিউর রহমান, মাতা- ফরমোজা বেগম, বয়স- ৩১,গ্রাম- ফরেস্ট অফিস পাড়া, ১৭ নং খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার, পেশা- সহকারী শিক্ষক (উদয়ন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়), সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাড়ি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২১/০১/২০২৫।
[৩৩] মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।
[৩৪] ওহীদুল আলম (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
[৩৫] সাক্ষাৎকার: শাহাব উদ্দিন খোকা, পূর্বোক্ত।
[৩৬] সাক্ষাৎকার: মঈন উদ্দিন চিশতি, পিতা- প্রয়াত বদিউর রহমান, মাতা- ফরমোজা বেগম, বয়স- ২৪, গ্রাম- ফরেস্ট অফিস পাড়া, ১৭নং খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার, পেশা- ছাত্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাড়ি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২১/০১/২০২৫।
[৩৭] সাক্ষাৎকার: শাহাব উদ্দিন খোকা, পূর্বোক্ত।
[৩৮] সাক্ষাৎকার: নুরুল বাশার রাসেল, পিতা- বশির আহমদ, মাতা- প্রয়াত জুলেখা বেগম, বয়স- ৩৪, গ্রাম- আলী আকবর পাড়া, হ্নীলা, টেকনাফ, কক্সবাজার, পেশা- শিক্ষকতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাড়ি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৮/০১/২০২৫।
[৩৯] ওহীদুল আলম (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৮।
[৪০] সাক্ষাৎকার: মো. ইজ্জতউল্লাহ, পিতা- মোঃ ইয়াসিন আলী, মাতা- আম্বিয়া খানম, বয়স- ৪৬, গ্রাম- লামার পাড়া,রামু, কক্সবাজার, পেশা-কৃষক, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাড়ি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১১/০৮/২০২৪।
[৪১] ধনিরাম বড়ুয়া, *রামুর লোকসাহিত্য*, (কক্সবাজার: কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী,২০১৭), পৃ.১৩৮।
[৪২] সাক্ষাৎকার: রহমান মুন্সী, পিতা- মোঃ আজিজ মুন্সী, মাতা- ইয়ারুন্নেসা, বয়স- ৬১, গ্রাম- পানির ছড়া,রামু, কক্সবাজার, পেশা- ব্যবসায়ী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাড়ি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৮/১২/২০২৪।
[৪৩] সাক্ষাৎকার: ফরমোজা বেগম, পিতা- প্রয়াত ওসমান গণি, মাতা- প্রয়াত জরিনা বেগম, বয়স- ৫৬, গ্রাম- ফরেস্ট অফিস পাড়া, ১৭নং খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার, পেশা- গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাড়ি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২১/০১/২০২৫।
[৪৪] সাক্ষাৎকার: দিলয়ারা বেগম, পিতা- প্রয়াত বদিউর রহমান, মাতা- ফরমোজা বেগম, বয়স- ৩১, গ্রাম- খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার, পেশা- গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান: নিজ বাড়ি, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২০/০১/২০২৫।
[৪৫] রামশঙ্কর চৌধুরী, *বিচিত্র বিবাহপ্রথা ও লোকাচার*, (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫), পৃ. দশ-এগারো।
[৪৬] শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকসংগীত সমীক্ষা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬), পৃ. ২৩০।
[৪৭] মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ০১।